রবীন্দ্রসংগীতে তান

রন্তিদেব মৈত্র

১৯৬০ বঙ্গাব্দে 'গল্পভারতী'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীতে 'তান' প্রবর্তন সম্বন্ধে মতামত জানানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অনুরোধে সাড়া দিয়ে তারাপদ চক্রবর্তী, সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবতী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ওস্তাদ ও সংগীতবিদ তাঁদের মতামত জানিয়েছিলেন- যেগুলি 'গল্পভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, যাঁরা মতামত জানাননি তাঁদের মধ্যে ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ, দিলীপ রায় ও শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

১৩৬০ - ১৪০৫ এই দীর্ঘ সময় পেরিয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়টিকে আবার নতুন করে ভেবে দেখবার দরকার হয়ে পড়েছে। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের গান ভারতীয় সংগীত ঐতিহ্য পরম্পরা বহির্ভূত নয়। একথা ঠিকই যে, রবীন্দ্রনাথের আগে এত কাব্যরস বিভূষিত সংগীত রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহের বিষয়। পাশাপাশি এটাও ঠিক রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা তাঁর সংগীত অনুসন্ধিৎসার পরিপূরক। একথা আরো বিশদভাবে বোঝাবার কিংবা বুঝবার দরকার আছে। রবীন্দ্রনাথের বেহাগ কিংবা রবীন্দ্রনাথের ইমন সনাতন বেহাগ ও ইমন থেকে একচুও নড়েনি এবং আমাদের শাস্ত্রীয় রাগ- রাগিনীর নিজস্ব প্রকাশ - ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের গানেও ভীষণভাবে বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ যদি বেহাগ কিংবা ইমনের কল্পনায় কবিতার ছবি আঁকেন তবে সেই ছবিগুলিও বেহাগ ও ইমনের নিজস্ব রঙেই রাঙা হয়ে উঠবে - এটাই স্বাভাবিক। এর কারণ, আমাদের জন্মলগ্নে কয়েক শত বছরের ইমন কিংবা বেহাগের স্মৃতি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি। আর সেই ইমন কিংবা বেহাগকে কখনো কোনো নির্দিষ্ট খাঁচায় বাঁধা যায় না। কিন্তু বর্তমানের রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞগণ রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত রাগ - রাগিনীগুলিকে রবীন্দ্রনাথের সোনার কলমের খাঁচায় বেঁধে ফেলে রবীন্দ্রসংগীতকে এক পৃথক সংজ্ঞা দিতে বদ্ধপরিকর। বিচিত্রশালী রবীন্দ্রনাথের গান যেন ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। সেই ব্যতিক্রমী মানকে পরিবশেন করতে হবে এক বিশিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতির তালিম নিয়ে - যেখানে রাগ - রাগিনীর অলংকারভূষণ একে একে খুলে নিয়ে তাতে বসাতে হবে রবিবাক্যের ভূষণ। আমরা সবাই একত্রিত ভাবে ভুলে গেছি যে, রবীন্দ্রনাথের গান ব্যতিক্রমী গান; তার কারণ, তার উৎকর্ষ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান প্রায়সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয় শাস্ত্রীয় পদ্ধতিগত ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের প্রয়োগে ভারতীয় সংগীতের মাপকাঠিতে নির্মিত হয়েছে। আমাদের মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষা দৈব সংযোগেনয় এবং রবীন্দ্রনাথ সনাতন ও নির্দিষ্ট শিক্ষাপন্থা থেকে কোনোদিন সরেও যাননি। অতি অল্প বয়সেই বিষ্ণুপুর ও বহিরাগত ওস্তাদদের শোনবার কান রবীন্দ্রনাথের তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তাই, বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত সংগীতস্রষ্টা ও গায়ক যদুভট্ট ও রাধিকা প্রসাদ গোস্বামীর গায়ন শৈলীর প্রভাব থাকবেই থাববে। যদুভট্ট খান্ডার বানী ধ্রুপদের শৈলী বেশি পছন্দ করতেন বলে আমরা শুনতে পাই এবং রাধিকা প্রসাদ গোস্বামীর ভান্ডারে ছিল খান্ডার বানী ও গৌহর বানীর শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ ও খেয়ালের সম্পদ। এইসব ধ্রুপদ ও খেয়াল কোনোটাই 'তান' বিবর্জিত নয়। এক্ষেত্রে আমরা 'তান'কে ব্যবহার করব তার মূলঅর্থে অর্থাৎ 'তন্' মনে বিস্তার এবং 'তান' মানেও বিস্তার। যদুভট্টের রচনা খান্ডার বানী হওয়াতে গমকের প্রাধান্য আমরা অস্বীকার করতে পারব না। ইদানিং কালে রাজেশ্বরী দত্ত ইমনে

রচিত'এ মোহ আবরণ' গানটিতে 'আবরণ' কথাটিতে নিয়ে যেরকম তান অথবা বিস্তার করেছেন তা অনেক রবীন্দ্ররসিক কটাক্ষ করলেও আমরা জানতে পেরেছি যে, রাজেশ্বরীর গাইবার শৈলী গোপেশ্বর / রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরী করা শৈলী। আর গোপেশ্বরবাবু রবীন্দ্রনাথের বীজ সংগীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন। এই গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তাঁর অনুজ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরলিপিতে তানও আছে, গমকও আছে। আর সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিয়য় হল তাতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্বীকৃতি।

গত পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্রনাথের যেসব রেকর্ড কিংবা ক্যাসেট বেরিয়েছে তার মধ্যে গোপেশ্বরবাবু কিংবা সুরেন্দ্র নাথের স্বরলিপি প্রায় কেউই অনুসরণ করেননি। যার ফলে রবীন্দ্রসংগীতে তানের প্রয়োগ কথাটা আজকের দিনে আমাদের কাছে প্রায় অপ্রাসঙ্গিকহয়ে গেছে। বর্তমানে রবীন্দ্রযোদ্ধাদের হাতে একই তুপের যে তাস বারবার দেখা দিচ্ছে, সেটি হল দিলীপকুমার রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের কিছু বিচ্ছিন্ন পত্রাবলী ও সংগীত চিন্তায় তানের বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কিছু নির্দিষ্ট উদ্ধৃতি। একটি ব্যাপক বিস্তৃত বিষয়কে দু'চারটি উদ্ধৃতির কৌটোয় পুরে ফেলে আমরা আজ রবীন্দ্রনাথের গানথেকে 'তান'ও 'উপজ' বাদ দিয়ে ফেলেছি এবং তার ফলে সব থেকে বেশি লাভ হয়েছে জনসাধারণের। তার কারণ, আজকে অতি অল্প আয়াসেই রবীন্দ্রনাথেরর গান গাওয়া যায়।

মোট কথা এই দাঁড়াচ্ছে যে, কোনো শাস্ত্রীয় কন্ঠ-শিল্পী যদি রবীন্দ্রনাথের গান গায় তাহলে, তার গানে রাগ-রাগিনী প্রয়োগেও তান আসবেই আসবে। কিন্তু শাস্ত্রীয় কন্ঠ শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের গান করেন না, অন্তত রেকর্ড ক্যাসেটে এবং তার ফলেই অবধারিত ভাবে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরলিপি আস্তে ধূলোয় পর্যবসিত হচ্ছে। আমাদের পরিপ্রেক্ষিত এতটা লম্বা ও চওড়া করতে হত না যদি বিশ্বভারতী বা রবীন্দ্রভারতী কিংবা আমাদের শিক্ষাতন্ত্র, জনসাধারণের কাছে দুটো ব্যাখ্যাই পাশাপাশি হাজির করত এবং মানুষের গ্রহীযুণ্ততার বিচার যদি ছেড়ে দিত মহাকালের উপর। কিন্তু তা হয়নি। তাই এ-বারে আমরা দেখব অতীত দিনের দিকপালগণ কি অভিমত পোষণ করতেন এবং তাঁদের মতামত আমরা গ্রহণ করব কীউপায়ে।

তারাপদ চক্রবর্তী রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র কাব্যের সেবা করে অনুভব করেছিলেন কবিগুরু কাব্য ও সাহিত্য যেমন কালভারী ও সর্বাত্মক, তেমনি তাঁর সংগীতও সর্বদেশিক ও সর্বাত্মক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তারাপদবাবু অক্ষেপ করে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনেক গান রাগ ও তাল বদ্ধ; কিন্তু তা জনসমাজে পরিবেশিত হচ্ছেনা বললেই চলে। তার প্রধান কারণ, সেইসব সংগীত পরিবেশন করতেগেলে যথেষ্ট কন্ঠ সাধনা করতে হয় এবং শুদ্ধ রাগ - রাগিনী ও বহু দুরূহ তালের জ্ঞানার্জন লাভ বিশেষ প্রয়োজন। তারাপদবাবু আরো জানিয়ে ছিলেন যে, স্বর্গীয় রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী কিংবা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্ঠে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা শোনাব সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। আর এই দুই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের গানে ধ্রুপদ, খেয়াল বা টপ্পার সমস্ত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতেন। এর ফলে প্রত্যেকটি মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই সংগীতের অনবদ্য গতি ও তান উপভোগ করত। তারাপদবাবু বিশেষ করে 'মন্দিরে মম কে আসিলে হে'এবং 'অল্প লইয়া থাকি তাই'- গাই দুটির পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ পাওয়ার

কথা বলেছেন। তাঁর শোনা পূর্ববর্তী শিল্পীদের কণ্ঠে সেই সবগানে ছোট ছোট তান, মীড়, মূর্ছনা সবই খেয়াল গানের শৈলীতে ব্যবহৃত হত। তিনি এও জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই এগুলি পরিবেশিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনো প্রতিবাদ করেন নি, বরং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন - যাঁহারা সত্যিকারের স্রষ্ঠা তাঁহাদের রচিত সংগীত কোনো বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞের দ্বারা পরিবেশিত হলে অন্য এক বিশিষ্ট রূপ ধারন করবে। তারাপদবাবু সবশেষে বলেছিলেন -- রবীন্দ্রনাথের গান খেয়াল অঙ্গীয় ও টপ্পা অঙ্গীয় করে গেয়ে তানের ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাহলে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসনে এবং রবীন্দ্র সংগীত একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করবে এবং সর্বভারতীয় সংগীতের আসনে এবং রবীন্দ্র সংগীত একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার কবে এবং সর্বভারতীয় উচচাঙ্গ সংগীতের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে।

সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন রবীন্দ্রনাধ ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ হিন্দীগানের অনুকরনে যে সকল গান রচনা করেছিলেন, সে সকল গান তাঁর যুগের প্রায় প্রত্যেক গুণী শিল্পীরা ইচ্ছামতো তান ও অলংকার প্রয়োগ করে গেয়েছিলেন। তার জন্য কখনো কেউ আপত্তি জানাননি; এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্তও না। সত্যকিংকরবাবু ইন্দিরাদেবীর স্বল্প ভাবে তান প্রয়োগের সমর্থনে ও সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। অবশ্য নিজের অভিমত শেষ করার আগে তিনি শিল্পীদের তান প্রয়োগের অধিকার নিয়ে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য ইন্দরাদেবীর সভানেতৃত্ব ও শৈলজাবাবু প্রমুখের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা চেয়েছিলেন। সত্যকিংকর বাবুর মতে রবীন্দ্রনাথের গান উচ্চাঙ্গ রাগ সংগীতশিল্পীদের কাছে বারবার আদরের ছিল। তাই সেইসব শিল্পীদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশিত হলে রবীন্দ্রসংগীত সর্বদেশের ও সর্বকালের সংগীত সভায় বিশিষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত হবে।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবিষয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারনা করেছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৮১-১৯শ্র সালে রাধিকা প্রসাদবাবুর গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া তিনখানি রবীন্দ্রসংগীত - ‘‘স্বপন যদি ভাঙিলে’’, ‘‘বিমল আনন্দে জাগো’’ এবং ‘‘মোরে বারে বারে ফিরালে’’ - উল্লেখ তিনি করেছিলেন। এই রেকর্ড বেরনোর পরে রবীন্দ্রনাথ, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেকে তাঁর সঙ্গে গ্রামোফোনে এই গান গুলি শুনতেন এবং সবাই মুগ্ধ হতেন গোঁসাইজীর মধুর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের ভাবানুযায়ী তান এ অলঙ্কার প্রয়োগ। অমলা দাসের কণ্ঠে গ্রামোফেন রেকর্ডে ‘চিরসখা ছেড়ো না মোরে’’গানটির কথা উল্লেখ করেছেন রমেশবাবু, যেখানে স্বপলিপি অবিকল অনুসরণ না করে গায়িকা অনেক সুর বৈচিত্র্য সংযোজন করেছেন। এছাড়া কবির জীবিতাবস্থায় মালতী ঘোষাল রেকর্ডে গেয়েছিলেন ‘কে বসিলে আজি’ এবং ‘হৃদয় বাসনা পূর্ণ হোলো’। এই গানদুটি টপ্পা ভাঙা গান এবং তান ও অলঙ্কার সংযোজনা করেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

১৯৩১ সালে কবিগুরু ৭০ বৎসর জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিরাট সভায় তাঁর বিভিন্ন ধারার গান গাওয়া হয়েছিল বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ‘‘আজি মম মন চাহে’’ গেয়ে শুনিয়েছিলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধ্রুপদ করে তিনি গানটি ‘দুন’ ইত্যাদি করে গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই গায়কীর মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন। রমেশবাবু আরো

জানাচ্ছেন যে, তাঁর নিজেরও বহুবার কবিকে ধ্রুপদাঙ্গ ও খেয়ালাঙ্গ গান শোনাবার সৌভাগ্য হয়েছে এবং কবির উচ্চাঙ্গ সংগীতেতান প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনো আপত্তি তাঁর নিজের বা তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষথেকে কোনো দিন আসেনি।

১৯৫০ সালের ৩০শে আগষ্ট ইন্দিরাদেবী রমেশবাবুকে এক চিঠিতে জানান যে, রবীন্দ্র পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে, তানের নতুন অলঙ্কার দেবার চেষ্টাতেও ইন্দিরাদেবীর সম্মতি ছিল। তার কারণ কোনো জিনিস বেশিদিন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ইন্দিরাদেবী একই চিঠিতে শৈলজাবাবুর এ কথাকে সমর্থন করে বলেছিলেন, রবীন্দ্রসংগীতেও তানের প্রয়োগ গোপেশ্বরবাবু প্রয়োগ করলে লোকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে জিনিসটা নিতেও পারে। তারাপদবাবু ও সত্যকিংকরবাবুর মতো রামেশবাবুও আক্ষেপ করছেন উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত সর্বভারতীয় সংগীতের মর্যাদা পাচ্ছেনা গায়কীর দোষে এবং বাঙালীকে এ বিষয়ে প্রচেষ্টা করে যেতে হবে।

সংগীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই প্রচেষ্টা সময়োপযোগী এবং বাংলার অমূল্য গীতরত্ন সম্বন্ধে জনগনের চেতনা হয়েছে গোপেশ্বরবাবুর ধারনায় রবীন্দ্রসংগীতে বেদ ও উপনিষদের বানী যেমন অতীতের জ্ঞানালোক থেকে সংকলিত, তেমনি তাঁর গানের সুরও স্মরণ করিয়ে দেয় ভারতের মহান সুরস্রষ্টাদের কথা। একই সঙ্গে গোপেশ্বরবাবু বলেছেন আমাদের এই সংগীত সীমাবদ্ধ নয়। শিল্পীর মনের অবাধগতি আমাদের সংগীতের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রসংগীতে এই ভারতীয় আদর্শ পূর্ণরূপে বিদ্যমান এবং বানীর ভাবকে রক্ষা করে সুরসজ্জায় সাজতে হবে গানকে। গোপেশ্বরবাবু এও বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ গান বরাবরই তান ও দুন যোগে গাওয়া হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন তিনি বরাবরই পেয়ে এসেছেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর মতামতে জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের অনেক গান তান প্রয়োগ অসঙ্গততো হবেই না বরং বহুস্থলে ও বহুবিষয়ে গীত পরিবেশনকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলবে। তিনি অবশ্য একথাও বলেছেন যে; শিল্পীকে গভীর ভাবে বুঝতে হবে কোনশ্রেনীর গানে তান দেওয়া যাবে। আর সেই তানের গঠন ও সংযোজন কী ভাবে করতে হবে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর বত্ত ব্যে জানাচ্ছেন, ভারতীয় সংগীত পাশ্চাত্য সংগীতের মতো রচয়িতার শাসন ও নির্দেশকে অপেক্ষাকরে না। সেচায় বন্ধন মুক্তি ও অনন্তের পথে বাধাহীন ভাবে যাত্রা করতে। তাই ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে গান রচয়িতার সার্থকতার উপরও সুরশিল্পীর নিজস্ব সৃষ্টি করার একটা স্বাধীনতা থাকেই। আর তাতেই প্রকাশ পায় শিল্পীর স্বকীয়তা বা মৌলিকতা। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে, উচ্চাঙ্গ সংগীতের সংযত পথচারীদের দ্বারা রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশিত হলে তার মাধুর্য আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কিন্তু তানের চাপে গানের শ্যামল ক্ষেত্র যেন উষর ভূমিতে পরিণত না হয় - এর দিকটা সংগীত শিল্পীদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করার পাশাপাশি তিনি সতর্কবানীও উচ্চারণ করেছেন।

সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর অবশ্য তানের ব্যাপারে যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর মতে, তানের স্বকীয়তা দিল রবীন্দ্রনাথের গানের চেহারা একেবারেই পাল্টে যাবে। বিশেষ কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের গানের কথা রস এতই গভীর যে, সেই কথাকেসুরের জড় বাহক করার কল্পনা রসের

দিক থেকে অপরাধ। তাঁর মতে যিনি গান গেয়ে থাকেন তিনি তো স্রষ্টা নন। তাই তাঁর পক্ষে সমগ্র রূপের ধারনা করা অসম্ভব এবং অন্যের সৃষ্টির উপর নিজেদের বাহাদুরী ফলানো একটা কারিগরী কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি অবশ্য বিটোভেন, মোৎজার্ট প্রমুখ পাশ্চাত্য সুরকারদের উপমা দেখিয়েছেন, যেখানে সুর রচয়িতার সুরে অন্যান্য শিল্পীদের কোনো নিজস্ব অলঙ্কার ফলাবার জায়গা নেই মোদ্দা কথা, তিনি গায়কদের আটপৌরে লোক বলেছেন। তাদের কাছে তানের ক্ষমতা মানেই সেই সব সুরকৌশলী গায়কের কৌশল দেখাবার রাস্তা খুলে দেওয়া।

উপরের আলোচনায় এতজন গুণি লোকের মতামত পাশাপাশি উপস্থাপনা করার কারণ, এই বিষয়টি আজ একেবারেই মৃত। আমরা জানি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে হওয়া ‘গল্পভারতী’-র প্রচেষ্টায় এই বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।।এই বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। এক দিকে দেখা যাচ্ছে যে, যাঁরা শাস্ত্রী সংগীতের কুশলী শিল্পী তাঁরা প্রত্যেকেই এক বাক্যে তানের স্বপক্ষে কথা বলেছেন। তার মানে, এইসব শিল্পীরা সাহিত্যরসে যথার্থ অধিকারী নন - এটা ভাবলে আমাদের ভাল করা হবে। তারাপদ চক্রবর্তী নিজেও সুকবি ও সুরকার। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অজস্র ধ্রুপদ, খেয়াল ও অন্যান্য গান রচনা করে গেছেন এবং সুরও দিয়েছেন। এ ছাড়া সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সুগায়ক, সুলেখক, সুকবি ও অভিজ্ঞ সুরকার। রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রীয় সংগীতে সুগায়কও সুপন্ডিত এবং সুরেশ চক্রবর্তী যন্ত্রসংগীতে দক্ষ শিল্পী ও শাস্ত্রজ্ঞ। ইন্দিরাদেবী রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা ছাড়াও গানের সুরাসিকা এবং রবীন্দ্রনাথের বহু গানের প্রেরণাদাত্রী। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সংগীত বিষয়ে সুলেখক ও বিশিষ্ট শাস্ত্রকার। এঁরা সবাই ভারতীয় সংগীতের পরমলগ্নে মুক্তির বাণীর কথা মেনে নিয়েছেন এবং সংগীত শিল্পীদের স্থান সংগীত রচয়িতার স্থান থেকে একেবারে ভিন্ন প্রদেশে চালনা করেননি। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের শিল্পীরা বন্ধনের মধ্যে মুক্তি খুঁজে নেন এবং শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গানের মর্ম গ্রহণ করা একেবারেই সম্ভব নয়। সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর সুরকার ও সংগীত শিল্পীদের ক্ষেত্রে একেবারে আলাদা করে দিয়েছেন। ভারতীয় সুরকারদের আসননির্মান করেছেন পশ্চিমী সুরকারদের ধ্যান ধারণা দিয়ে। তিনি ভারতীয় সংগীত শিল্পীদের নেহাত কারিগরের আখ্যা দিয়েছেন, যা অসার্থক সংগীত শিল্পীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু গোপেশ্বরবাবুরা নির্দেশ দিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের গান প্রতিভাশালী শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীরাই গাইতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে তান ও অলঙ্কারের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের গানে নতুন ভাষ্য হিসাবে দেখা দেবে। মৃত স্বরলিপির শব ব্যবচ্ছেদ থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের গানকে হয়ত স্বরলিপি অতিক্রমী করে তুলতে পারব। এর জন্য আমাদের হাতে এখনও সময় রয়েছে। তার কারণ, গোপেশ্বর বাবুদের করা কিছু কিছু স্বরলিপি দুষ্প্রাপ্য হলেও অপ্রাপ্য নয়। তার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, কৃষ্ণভামিনী, মিস্ রাধারানী, বীনা চক্রবর্তী, অমলা দাস, সাহানাদেবী, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরেন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া শতাধিক রবীন্দ্রনাথের রেকডিং আছে। এগুলি প্রচারের ব্যবস্থা করলে হয়ত আমাকে এই প্রবন্ধ লিখতে হোতো না। কারণ গোপেশ্বর অনুজ সুরেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রগান পরিচিত তর্কাতীত) মালতী ঘোষাল, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও রাজেশ্বরী দত্তের কিছু কিছু রেকর্ড বা রেকডিং এখনো বর্তমান। এইসব শিল্পীদের গায়কীতে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব বিস্তারিত হয়েছিল কিনা তা বিচার করুক আজকের শ্রোতারা। আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, এই সব শিল্পীদের রেকর্ডিং সমগ্র অবিলম্বে প্রকাশিত হোক।